শ্রাবণ ধারা
দর্পণ কবীর

নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটস এলাকার ফুটপাত দিয়ে আনমনে হেঁটে যাচ্ছিলো রাজীব। সোনাচান্দি জুয়েলারী শপের সামনে দাঁড়িয়ে ভীষণ চমকে উঠলো ও। এই জুয়েলারী শপের ভেতরে দাঁড়িয়ে আছে নীলা। দীর্ঘ আট বছর পর নীলাকে এক ঝলক দেখেই চিনতে পারলো ও। আট বছর নয়, আট হাজার পরও নীলাকে এক দেখাতেই চিনতে পারবে রাজীব। নীলাকে দেখে রাজীবের ভেতরে মিহিন ভাঙাচোরা হতে লাগলো। ও প্রথমে ভাবলো নীলার সঙ্গে দেখা করবে না। কী হবে এখন দেখা করে? আজ এতোদিন পর পুষে রাখা আগুনকে উস্কে দিয়ে কী হবে? এ প্রশ্ন ওর ভেতরে তোলপাড় তুললেও একটা অদৃশ্য টানও তীব্রভাবে অনুভূত হতে লাগলো। রাজীব এগুতে গিয়ে টের পেল ও পা যেন অনড় পাথর হয়ে গেছে। ও খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো ঐ জুয়েলারী শপের সামনে। দোকানের বিশাল আয়নার ভেতর দিয়ে ও অপলক দেখতে লাগলো নীলাকে। এই কয়েকটি মুহুর্তে রাজীবের পৃথিবী লন্ডভন্ড হয়ে গেল। ওর ভেতরে আবেগ হলো বরফ গলা নদী। এক সময় নিজের কাছে হার অথবা জয় হলো নিজেরই। ও পা বাড়ালো সোনাচান্দি জুয়েলারী দোকানের দিকে। ভেতরের কষ্টকে সামলে নেবার চেষ্টাও করলো। অনেক মানুষকেই জীবনের বিশেষ কোন সময়ে নিজেকে সামলে নিতে হয়।

নীলা সোনাচান্দি জুয়েলারী শপে বিক্রয় প্রতিনিধির চাকরি করে। আজ ক্রেতার ভিড় নেই। ক্রেতা না থাকলে ও কাঁচের স্যুকেসের মধ্যে রাখা স্বর্ণালংকার ভালোভাবে সাজিয়ে নেয়। কখনো নতুন নতুন ডিজাইনের স্বর্ণালংকারের দিকে মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে থাকে। নীলা এই মুহুর্তে স্বর্ণালংকার সাজাচ্ছিলো। রাজীব নীলার সামনে গিয়ে আলতো গলায় বললো,
‘আমাকে বিয়ের কনের জন্য একসেট ভালো গহনা দিতে পারেন?’
কণ্ঠ নয়, যেন বিদ্যুতের চমক। এই কণ্ঠে ভীষণ চমকে গেল নীলা। চোখ তুলতেই আরো গভীর বিস্ময়ের ধাক্কা! ওর চোখের সামনে রাজীব দাঁড়িয়ে আছে। নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারছিল না ও। আর্ত চিৎকারের মতো ওর কণ্ঠ থেকে অস্পষ্ট নাম বেরিয়ে এলো,
‘রা-জী-ব!’
‘হ্যাঁ, এতো অবাক হচ্ছো কেন?’
‘সত্যিই তুমি! আই মিন, তুমি আমেরিকায়! কীভাবে এলে!’
নীলার এই বিস্ময়ের সঙ্গত কারণ আছে, তা জানে রাজীব। নীলা যে রাজীবকে দেখেছে, সেই রাজীবের আমেরিকায় আসাটা পৃথিবীর অষ্টম আশ্চার্যের ব্যাপারের মতোই। একেবারেই

অবিশ্বাস্য। কিন্তু রাজীবের যে দিন বদলে গেছে, সে কথা তো নীলা জানে না। রাজীব কণ্ঠে বিস্ময় ছড়িয়ে বললো,
'বাহ্, আমেরিকায় শুধু তোমরাই আসবে নাকি? ওপি-ডিভি বা বৈবাহিক কারণ ছাড়াও অনেকে এই দেশে আসতে পারে। তা জানো?'
'না, মানে..!'
'তুমি যে রাজীবকে চিনতে, সে ছিল বেকার ও ভবঘুরে। ব্যর্থ কবিও বটে। আজকের রাজীব সফল ও স্বচ্ছল একজন চাকরিজীবী।'
'তাই নাকি! তা দেশে কি করছো?'
'একটা এনজিওতে প্রজেক্ট পরিচালক পদে চাকরি করছি। নিউইয়র্কে এসেছি জাতিসংঘের একটি সেমিনারে অংশ নিতে।'
'বলো কি!'
'হ্যাঁ। এখানে এসে ভাবলাম, বাঙালি আধ্যুষিত এলাকা জ্যাকসন হাইটসে ঘুরে যাই। তাই এলাম। আর দেখো, তোমাকে পেয়ে গেলাম!'
নীলার মুখে কোন কথা জোগায় না। ও ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকে রাজীবের মুখের দিকে। ও এক নতুন রাজীবকে দেখছে। নীলার তন্ময়তা ভেঙে দিয়ে রাজীব বললো,
'অমন হা করে কি দেখছো?'
'রাজীব আমি কেমন ঘোরের মধ্যে ডুবে আছি। সত্যিই কি আমার সামনে তুমি?"
'হ্যাঁ, আমিই তোমার সামনে। তা কেমন আছো?'
ধাতস্থ হয়ে আসে নীলা। ওর শিরা-উপশিরায় কষ্ট ছড়িয়ে যাচ্ছে। ও দাঁত দিয়ে নীচের ঠোঁট কামড়ে ধরে। এটা ওর পুরানো অভ্যাস। রাজীবের সামনে অভিমান বা রাগ করলে ও ঠোঁট কামড়ে ধরে রাখতো। কোন কথা বলতো না। এ দৃশ্যটা রাজীবকে কাঁপিয়ে দিল। ও তাগিদ দিয়ে বললো,
'স্বামী-সংসার নিয়ে এই স্বপ্নের দেশে কেমন আছো, বললে না যে?'
'ভালোই আছি। তুমি?'
'স্বাভাবিক এবং কাজ নিয়ে ব্যস্ত্ড় থাকি।'
'কেন তোমার স্ত্রীকে সময় দেও না?'
এ কথায় হো হো করে হেসে ফেললো রাজীব। ওর হাসিতে বিব্রত হয়ে পড়লো নীলা। ওর সহকর্মী নাজরা ওদের কথা শুনছে। তবে নাজরা বাংলা বুঝে না। ও ইন্ডিয়ান। তবুও রাজীবের সঙ্গে নীলার কথাবার্তা যে, ক্রেতা ও বিক্রেতার নয়, তা ও নিশ্চয় বুঝতে পারছে। তা বুঝুক। নীলা আজ ওসব নিয়ে ভাবতে চায় না। আট বছর পর রাজীবকে ও দেখছে। যাকে একদিন না দেখলে ওর কোনকিছুতেই মন বসতো না, আজ তাকে দেখছে আট বছর পর। ওর ভেতরে সে-কী উথাল পাতাল ঢেউ বইছে! রাজীব হাসি থামিয়ে বললো,
'সরি, অনেকদিন পর খুব হাসলাম।'
'আমি কি হাসির কথা কিছু বলেছি?'

‘তা নয়। তবে..?’
‘তবে কি?’
‘না কিছু না। তুমি এই চাকরিটা কতদিন যাবত করছো?’
‘কথা ঘুরাবে না। আগে বলো, তোমার স্ত্রী কেমন আছে? তুমি কেমন আছো, ধনীর মেয়েকে বিয়ে করে?’
এই প্রশ্নের জবাবে রাজীব কি বলবে, তা ভেবে পাচ্ছে না। প্রশ্নটার জবাব দেয়া যায় না। আবার এখন আর মিথ্যা বলা ঠিক হবে কিনা-তাও ভাবছে ও। নীলার কৌতুহলী চোখ প্রশ্ন হয়ে আটকে রইলো রাজীবের বিব্রতকর মুখের দিকে। অস্বস্থিতে পড়ে রাজীব ভাবতে লাগলো ও কী করে বলবে যে, ওর স্ত্রী বলতে কেউ ছিল না, এখনও নেই। তাহলে অনেক প্রশ্ন উঠবে। এর জবাব ও দিতে পারবে না। রাজীবের চোখের সামনে জ্বলজ্বলে করে ভেসে উঠলো আট বছর আগের দুটো ঘটনার কথা। দুটো ঘটনাই একটি অপরের পরিপূরক। আজ সে ঘটনার কথা নীলাকে বলা যায় না। স্মৃতির খামে বেদনার নক্ষত্র হয়েই থাকুক তা। ভাবে রাজীব। ওর মন ছুটে যায় ফ্লাশব্যাকে।

আট বছর আগের কথা। লেখাপড়ার পাঠ চুকিয়ে রাজীব হন্যে হয়ে চাকরি খুঁজছে তখন। হতাশা, আক্ষেপ, স্বপ্ন ও সংগ্রাম ছিল ওর দিনলিপিতে। মধ্যবিত্তের টানাপোড়ন, অপ্রাপ্তির দহন, আর স্বপ্ন ভাঙা-গড়ার সাতকাহনে ভরা জীবনের সঙ্গে নীলাকে জড়িয়ে নিতে চেয়েছিল রাজীব। নিজের দারিদ্রতা নিয়ে ওর কোন সংকোচ ছিল না। নীলাকে ভালোবেসে ও জীবনের স্বার্থকতা খুঁজে পেত। কিন্তু একদিন ভালোবাসার অন্য মানে এসে দাঁড়ালো ওর সামনে। ভালোবাসার মানুষকে ‘সুখী’ দেখার দৃষ্টি খুলে গেল সেদিন। নীলা’র মা ওর দৃষ্টিভঙ্গি বদলে দিল। নীলা মায়ের আকুতির কাছে হেরে গেল রাজীব। একদিন সকালে নীলা’র মা এলেন রাজীবের মেসে। তিনি মায়ের দাবি নিয়ে রাজীবকে বললেন,
‘বাবা, আমি জানি, তুমি নীলার ভালো চাও। নীলার বাবা সামান্য একজন চাকরিজীবী। আমার আরো তিনটি মেয়ে আছে। অভাব-অনটনের সংসার। তুমি নিশ্চয় আমাদের সব কথা জানো।’
‘জানি, মা। আপনি কি বলতে চাচ্ছেন?’
‘নীলার জন্য একটি ভালো বিয়ের প্রস্ড়্াব এসেছে। ছেলে আমেরিকায় থাকে! নীলা যদি এই বিয়েতে রাজী হয়, আমরা বেঁচে যাই। ওর ছোট তিনটি বোনের ভবিষ্যতও এই বিয়ের উপর নির্ভর করছে, বাবা। বিয়েটি একটি অসহায় পরিবারকে ওক্ষা করতে পারে। কিন্তু নীলা এই বিয়েতে রাজী হচ্ছে না। একমাত্র তুমিই পারো ওকে রাজী করাতে।’
এ পর্যন্ড়্ বলে নীলার মা কাঁদতে লাগলেন। রাজীব বিব্রত ও বিষন্ন হয়ে পড়লো। একসময় ও বললো,
‘নীলাকে আমি কিভাবে রাজী করাবো?’

‘আমি জানি না, বাবা। শুধু বুঝি, তুমিই পারবে ওকে রাজী করাতে। একজন অসহায় মাকে সাহায্য করো, বাবা! তোমার উপর আমাদের ভাগ্য নির্ভর করছে।’

মাত্র কয়েক মুহূর্তে রাজীব ভেঙে চূড়ে কেমন বদলে যেতে থাকে। নীলার মায়ের কান্না আর আকুতির সামনে ও ত্যাগের মহিমাকে বেছে নেয়। একদিকে নিজের অসহায়ত্ব, অপরদিকে নীলা এবং ওর পরিবারের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের চিন্তার কথা ভাবিয়ে তোলে ওকে। একসময় নীলার মায়ের আকুতিই জিতে যায়। রাজীব বলে,

‘আপনি বাসায় চলে যান। দেখি, আমি কি করতে পারি।’

‘তুমি কথা না দিলে আমি যাবো না, বাবা।’

অশ্রুভরা চোখ তুলে নীলার মা বলেন। রাজীব কথা দেয়। এ ছাড়া ওর আর কোন উপায় ছিল না। নীলার মা চলে যাবার সময়ও বারবার বললেন,

‘তুমি কিন্তু কথা দিয়েছো, বাবা! যেভাবেই হোক, ওকে রাজী করাতে হবে।’

‘আচ্ছা!’

এরপর রাজীব নিজেকে খুব দ্রুত তৈরি করে নেয়। নীলাকে ফিরিয়ে দিতে গুছিয়ে একটি চিত্রনাট্য তৈরি করে। নীলাকে রাজীব পত্র লিখে জানিয়ে দেয় যে, ও একজন ধনী ব্যক্তির মেয়েকে বিয়ে করতে যাচ্ছে। ঝড় হয়ে ছুটে আসে নীলা। রাজীবের দিকে অবাক চোখে তাকিয়ে বেদনা বিধুর কণ্ঠে বলে,

‘সত্যিই তুমি বিয়ে করতে যাচ্ছো! টাকার লোভে..ছিঃ!’

‘নিজের দারিদ্র্যতাকে জয় করার অন্যকোন পথ আমার জানা নেই। দারিদ্র্যতাকে মেনে নেবার সাহস বা ইচ্ছা কোনটাই আমার নেই। তাই, ধনী হতে আমি তোমাকে ত্যাগ করছি।’

‘ছিঃ রাজীব, ছিঃ!’

‘আমাকে ক্ষমা করো, নীলা।’

‘ক্ষমা? তোমাকে করুণা করতেও আমার রুচিতে বাঁধছে। তুমি ঘৃণারও অযোগ্য!’

সেদিন অপরাধীর মতো মাথা নিচু করে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিল রাজীব। নীলার অঝোর কান্নার সামনে পাষাণ পাথর হয়ে গিয়েছিল ও। নীলা ফিরেছিল ওর প্রতি একরাশ ঘৃণা নিয়ে। অথচ আজ ওকে দেখামাত্রই নীলা সব ভুলে কেমন ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। নারীরা নদীর মতোই সব সহে যায়, বয়ে যায়। রাজীব সেদিনের কথাই ভাবছিল। নীলা বললো,

‘উদাস হয়ে কী ভাবছো?’

‘না, কিছু না।’

‘তাহলে চুপ করে আছো যে! বললে না তোমার স্ত্রী কেমন আছে? ছেলে-মেয়ের বাবা হয়েছো কিনা?’

রাজীব এবার একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো। বললো,

‘নীলা, আজ তোমাকে সত্যি কথাটি বলছি। আমি বিয়ে করিনি।’

‘হোয়াট! কি বললে!’

‘তুমি শান্ত হও।’

‘সেদিন যে বলেছিলে..?’
‘সেদিন মিথ্যা কথা বলেছিলাম। ঠিক বলেছিলাম নয়, বলতে বাধ্য হয়েছিলাম।’
‘রা-জী-ব!’
‘নীলা তোমাকে না পাওয়ার দুঃখ আমার নেই। তুমি ভালো আছো, এ টুকুই আমার আনন্দ।’
‘চুপ করো! সেদিন কেনো মিথ্যা বলেছিলে? দেবদাস হবার জন্য?’
এ কথা বলেই নীলা অঝোর কান্নায় ভেঙে পড়লো। ওর সহকর্মী নাজরা এই দৃশ্যে ‘হোয়াটস হ্যাপেনড!’ বলে চেঁচিয়ে উঠলো। নীলা কান্না সামলানোর চেষ্টা করলো না। রাজীব ওর কান্নার সামনে খুবই অপ্রস্তুত হয়ে গেল। ও নীলা কান্না দেখতে চায় না। রাজীব হঠাৎ হনহন করে দরোজার দিকে এগিয়ে গেল। পেছন থেকে কান্না জড়িত গলায় নীলা ডাকলো,
‘রাজীব!’
রাজীব ওর ডাকে সাড়া দিল না। পেছনে ফিরে তাকালো না। রাজীব ওর দু’ চোখের শ্রাবণ ধারা দেখাতে চায় না নীলাকে। কিছুতেই না। ঝড়ো গতিতে ও বেরিয়ে এলো দোকান থেকে।

এপ্রিল, ০৫
নিউইয়র্ক